ধর্মমঙ্গল কাব্যকে ‘রাঢ় অঞ্চলের জাতীয় মহাকাব্য’ বলা হয় কেন? একজন শ্রেষ্ঠ ধর্মমঙ্গল কাব্য রচয়িতার কাব্য প্রতিভার পরিচয় দাও।

বিষয়বস্তুর প্রাচীনত্বে ও বিভিন্ন ধর্মমতের সমন্বয় প্রয়াসের প্রত্যক্ষ নিদর্শন রূপে ধর্মমঙ্গল কাব্যই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মধ্যযুগীয় দৈব নির্ভরতাবাদী মঙ্গলকাব্য ধারায় ধর্মমঙ্গলের স্থান কিছুটা ভিন্ন ধরনের। এই স্বাতন্ত্র্য মূলত ধর্মঠাকুরের স্বরূপে, ভৌগোলিক অবস্থানে এবং বিষয়বস্তুর বর্ণনা ভঙ্গিমায়। তাই এই কাব্য নিয়ে নানা দাবী উপস্থাপিত হয়েছে। এমনও দাবী করা হয়েছে যে ধর্মমঙ্গল রাঢ়ের জাতীয় কাব্য।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের ঐতিহাসিকতা:-

ধর্মমঙ্গলের কাহিনির পেছনে যে ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু রয়েছে তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাল বংশের সমাপ্তি পর্বকে এই কাহিনির পটভূমি হিসাবে মনে করা হয়। এই কাহিনির ইছাই ঘোষ, লাউসেন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এই কাব্যে যুদ্ধ-বিগ্রহজনিত উত্তেজনামূলক ঘটনা প্রাচুর্যময় বাংলার ঘটনাকেই সূচিত করে। ধর্মঠাকুরের উৎসব কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের উৎসব। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে সাধারণ বাঙালির যে মেরুদণ্ডহীন নমনীয়তা দেবতার অভিপ্রায়ের কাছে সমর্পিত হয়েছে, তার বিপরীত রূপটিই এখানে প্রকাশিত। ধর্মমঙ্গলে রাঢ়ের রাজনৈতিক জীবনযাত্রা ও তার নিম্নশ্রেণির নর-নারীর মহিমান্বিত দেশাত্মবোধের যে উজ্জ্বল রসসমৃদ্ধ চিত্র আমরা পাই তাতে একে রাঢ়ের জাতীয় কাব্য রূপে অভিহিত করা যায়।

ধর্মমঙ্গল রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য

ধর্মমঙ্গলকে যদিও দেবমাহাত্ম্যমূলক কাব্য বলা হয়ে থাকে এবং দেবতার পূজা প্রচারের পর এই কাব্যের কাহিনির পরিসমাপ্তি হয়েছে; তথাপি এই কাব্যের ঘটনা ও কাহিনি বিশ্লেষণ করলে সেখানে মহাকাব্যের কাঠামো উপলব্ধি করা যায়। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো ধর্মমঙ্গলের উদ্দেশ্য পূজা প্রচার হলেও এতে ঘটনা-সংঘাত, বিচিত্র চরিত্রের ভীড়, শাখাকাহিনির প্রাচুর্য, অধিকাংশ চরিত্রের পূর্বজীবনের পৌরাণিক আখ্যান, ইন্দ্রিয়বিলাস, মিথ্যা ও অধর্মের পরাজয় এবং ধর্মের জয়—এত কাহিনির প্রাচুর্য আর কোন মঙ্গলকাব্যে নেই।

মহাকাব্যের মূল লক্ষণগুলি হল—

১) মহাকাব্য হবে সর্গবদ্ধ কমপক্ষে আটটি সর্গে বিভক্ত হবে।

২) ধীরোদাও গুণ সম্পন্ন দেব সভাব ব্যক্তি হবেন এর নায়ক।

৩) ধীর, শান্ত, শৃঙ্গার এসব রসের যে কোন একটি হবে এর প্রধান রস এবং অন্যান্য যা যা করুন হাস্য বিভৎস ইত্যাদি এর আনন্দ হবে।

৪) মহাকাব্যের প্রতিটি সর্গ শুরুতে হবে এক ছন্দে আর শেষ হবে আর এক ছন্দে।

৫) একটি সর্গের শেষে পরবর্তী সর্গের আভাস থাকবে।

৬) অর্থ, ধর্ম, মোক্ষ, কাম, এই চার-ই বর্গের আবশ্যক মত সমবেশ থাকবে।

৭) শুরুতে নমস্কার, আশীর্বাদ অথবা বস্তু নির্দেশ থাকবে।

৮) কবি বৃত্ত, নায়ক বা অন্য কোন প্রধান চরিএ অবলম্বনে নামকরণ করবেন।

৯) প্রত্যেক সর্গের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ থাকবে |

অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্তী

ধর্মমঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি হলেন ঘনরাম চক্রবর্তী। ঘনরাম অষ্টাদশ শতাব্দীর শক্তিমান কবি। মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্যযুগের শেষ পর্যায়ে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন, ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল নির্বাণোন্মুখ দীপশিখার মতো সর্বশেষ জ্যোতি।

সুকুমার সেন লিখেছেন,– “ধর্মমঙ্গল রচয়িতাদের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিত ও দক্ষ ছিলেন ঘনরাম চক্রবর্তী। ঘনরাম সুলেখক ছিলেন। তাঁহার রচনা সর্বাধিক পরিচিত ধর্মমঙ্গল কাব্য”।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও লিখেছেন, –“আধুনিক যুগের বাঙালী সমাজ তাঁহার কাব্য হইতেই ধর্মমঙ্গল কাব্যের নূতনত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই শাখার অন্যান্য শক্তিশালী কবি অপেক্ষা ঘনরাম অধিকতর ভাগ্যবান। কারণ ধর্মমঙ্গলের কবিদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম মার্জিত রুচির নাগরিক সমাজে পরিচিত হন।

ঘনরামের ব্যক্তি পরিচয় সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন ও সুকুমার সেন কিছু তথ্য জানিয়েছেন।সেই তথ্যাদি অনুসরণে দেখা যায়—

ক) ঘনরামের নিবাস বর্ধমান জেলার কইয়ড় পরগনার কৃষ্ণপুর গ্রামে।

খ) ঘনরামের পিতা হলেন গৌরীকান্ত, মাতা সীতা। (সুকুমার সেনের মতে—মা হলেন মহাদেবী)।

গ) ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে কবির জন্ম।

ঘ) কবি শৈশবে দুরন্ত স্বভাবের ছিলেন। সেজন্য কবির পিতা কবিকে সে সময়ে রামপুরের টোলে বিদ্যার্জনের জন্য প্রেরণ করেন। সেখানে তাঁর গুরু তাঁকে কবি প্রতিভার জন্য ‘কবিরত্ন’ উপাধি প্রদান করেন।

ঙ) বর্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্তিচন্দ্র রায়ের আদেশে ঘনরাম ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

চ) ঘনরাম অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই তার কাব্য রচনা করেন ।

ছ) যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এবং বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ঘনরামের কাব্য সমাপ্তি কাল ১৬৩৩ শকাব্দ বা ১৭১১ খ্রিস্টাব্দ।

জ) ঘনরামের কাব্যের নাম 'অনাদিমঙ্গল'। তবে অনেক ক্ষেত্রে 'শ্রীধর্মসঙ্গীত', 'মধুরভারতী' প্রভৃতি নামও ব্যবহার করেছেন কবি।

ঝ) তাঁর কাব্য চব্বিশটি পালায় বিভক্ত এবং কাব্যের শ্লোক সংখ্যা ৯১৪৭। পালাগুলি হল—(১) স্থাপনা পালা, (২) ঢেকুর পালা, (৩) রঞ্জাবতীর বিবাহ পালা, (৪) হরিশ্চন্দ্র পালা, (৫) শালেভর পালা, (৬) লাউসেনের জন্মপালা, (৭) আখড়া পালা, (৮) ফলকনির্ম্মাণ পালা, (৯) গৌড়-যাত্রা পালা, (১০) কামদল বধ পালা, (১১) জামতি পালা, (১২) গোলাহাট পালা, (১৩) হস্তিবধ পালা, (১৪) কাঙুরযাত্রা পালা, (১৫) কামরূপ যুদ্ধ পালা, (১৬) কানাড়ার স্বয়ম্বর পালা, (১৭) কানাড়ার বিবাহ পালা, (১৮) মায়ামুণ্ড পালা, (১৯) ইছাই বধ পালা, (২০) অঘোরবাদল পালা, (২১) পশ্চিম উদয় আরম্ভ পালা, (২২) জাগরণ পালা, (২৩) পশ্চিম উদয় পালা এবং (২৪) স্বর্গারোহণ পালা।

এছাড়াও, ধর্মবিশ্বাসে কবি ঘনরাম উদার ছিলেন। কবি ধর্মঠাকুরকে ব্যাপক অর্থে নীতিপরায়ণ দেবতারূপে গ্রহণ করেছেন। তিনি বিষ্ণু, শিব, কালী, দুর্গা প্রভৃতি সমস্ত দেবতার প্রতি ভক্তিমান ছিলেন। তবে ভক্তিধর্মে রামবাদে তাঁর বিশেষ আস্থা ছিল। কবি ধর্মঠাকুরকে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে অভেদ মনে করতেন। কেননা, তিনি তাঁর কাব্যের ভণিতায় বারবার রামভক্তির উল্লেখ করেছেন। যেমন, 'আশীর্বাদ কর যেন রাঘবে রয় মতি', 'প্রভু মোর কৌশল্যানন্দন কৃপাসন', 'শ্রীরাম কিঙ্কর দ্বিজ ঘনরাম গান' ইত্যাদি।

ঘনরামের কাব্য রচনায় দেবতার স্বপ্নদেশের কোন বিবরণ নাই। মনে হয় গুরুর আদেশেই তিনি কাব্য রচনা করেন। তবে কোথাও তিনি গুরু নাম উল্লেখ করেন নি।

ঘনরামের কবিত্ব/কৃতিত্ব :

ধর্মমঙ্গলে বিষয়মহিমা ও কাহিনির বিচিত্র গতি থাকলেও একে কেবল কাহিনি বর্ণনায় পর্যবসিত না করে ঘনরাম তার কাব্যে প্রকাশভঙ্গির চারুতা ও শিল্পরীতির মনোহারিতার সংযোগে রূপায়িত করেছেন।

গতানুগতিক কাহিনি বর্ণনার মধ্যে ঘনরামের সচেতন মণ্ডনকলা, আলঙ্কারিক শিল্পচাতুর্য এবং সর্বোপরি মহৎ শিল্পীজনোচিত সংযম ও পরিমিতি বোধ, ঔচিত্যের ঔদার্য তাঁর কাব্যকে বিশিষ্ট করেছে।

মঙ্গলকাব্যের মধ্যে প্রত্যাশিত স্থূলতা ও অশ্লীলতার অতিক্রম করে ঘনরাম তার মার্জিত ও শোভনরুচি, সূক্ষ্ম রসবোধ এবং প্রশান্ত কৌতুক, সংযমবোধ ও পরিণত শিল্পবোধের যে পরিচয় দিয়েছেন, তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় তাতেই পাওয়া যায়।

ঘনরাম ধর্মমঙ্গল কাব্যধারায় শ্রেষ্ঠ কবি। ঘনরাম কাহিনি গঠনে এক বিশেষ কবি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি তাঁর কাব্যকে রামায়ণ-মহাভারতের আদর্শে রচনা করেছেন। একদিকে পৌরাণিক মহাকাব্যের রীতি অন্যদিকে ধর্মমঙ্গলের ঘনপিনদ্ধ কাহিনি—এই দুই ধারাকে ঘনরাম একত্র মিলিয়ে দিয়েছেন।

ঘনরাম তার কাব্যের সমগ্র কাহিনি ও চরিত্র পৌরাণিক মহাকাব্যের আদর্শে বয়ন করেছেন বলে, কাব্যের সর্বত্রই পৌরাণিক মহাকাব্যের আবহ সৃষ্টি হয়েছে। এতে একদিকে যেমন পৌরাণিক আদর্শ গ্রহণ করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনই নাটকীয়তা সৃষ্টি করে কাহিনির গতিদান করা হয়েছে।

ঘনরাম তাঁর কাহিনি গঠনে মূল কাহিনির সঙ্গে শাখা কাহিনি ও উপকাহিনি যুক্ত করে মহাকাব্যোচিত বিশালতা দিতে চেষ্টা করেছিলেন।

২৪টি পালায় প্রায় ২২ হাজার শ্লোকে কবি বিশালায়তন কাব্য রচনা করে নায়কের বিস্ময়কর কার্যাবলীর সুসংবদ্ধ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। ঘনরামের কাব্যে প্রাত্যহিকতার গ্লানি ও আদি রসের ক্লেদাক্ত জগৎ নেই।

তিনি তাঁর কাব্যকে এক অধ্যাত্মচেতনার স্তরে উন্নীত করেছেন।

ঘনরামের কাব্যে বাস্তববোধের ব্যাপক পরিচয় পাওয়া যায়।

ঘনরামের কাব্যে সচেতনভাবেই এই বাস্তববোধের পরিচয় দেখা যায়। এই দিক দিয়ে ঘনরামের মধ্যেই আধুনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। চরিত্র চিত্রণে লক্ষণ সর্বাধিক। প্রত্যেকটি চরিত্রকে তিনি পরিবেশ অনুযায়ী গড়ে তুলেছেন।

চরিত্র চিত্রণে ঘনরামের কৃতিত্ব সর্বাধিক। প্রত্যেকটি চরিত্র তাঁর কাব্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

ঘনরামের প্রবাদ, অলংকার, ছন্দ ও শব্দ প্রয়োগে দক্ষতা দেখা যায়।

বিভিন্ন রসের বর্ণনায়, বিভিন্ন ছন্দ প্রয়োগে ঘনরামের কুশলতা লক্ষ করা যায়। পয়ার ছন্দেই কাব্য রচিত। মাঝে মাঝে ত্রিপদীর ব্যবহার আছে।

শব্দ নির্বাচন ও শব্দ প্রয়োগে ঘনরামের দক্ষতা দেখা যায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবেশ রচনায় বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগে।

হাস্য ও কৌতুক রস সৃষ্টিতে ঘনরাম আশ্চর্য মার্জিত রুচি, শোভন পরিমিতি বোধ ও সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

কবির রচনায় নানা রসের সমাবেশ ঘটেছে। শৃঙ্গার, বীর, রৌদ্র, করুণ প্রভৃতি সব রসের বর্ণনাই আছে।

উল্লিখিত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে ঘনরাম যেভাবে তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনায় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তাতে তাকে ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবিই বলা হয়। তাই অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, “চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ঐশ্বর্য যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি যেমন ভারতচন্দ্র, ঘনরামও তেমনি ধর্মমঙ্গল কাব্যের ঐশ্বর্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি।”